ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 03. No. 02. January 2010

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচী: একটি পর্যালোচনা

মো. সুলতান মাহমুদ*
মো. হুমায়ূন কবীর**
মো. সেকান্দার আলী***

সারসংক্ষেপ

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় এ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। শিক্ষা হল সকল উন্নয়নের ধারক। আর এ লক্ষ্যে সকল শিশুকে স্কুল শিক্ষার আওতায় আনা ও তাদের ধরে রাখার বিষয়টি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। এ দিক দিয়ে স্কুলগামী শিশুদের কার্যকরী ফিডিং সিস্টেম অন্যতম চলক। বস্তুত: এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে শিশুদের শরীরের পুষ্টিমান বাড়ছে। অধিকন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে স্কুল ব্যবস্থ্যায় ফিডিং কর্মসূচী যথাযথ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের ফিডিং কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা মূলক পদ্ধতি হিসেবে মাধ্যমিক উৎসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকা

শিক্ষা সর্বজনীন মানবাধিকার। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্র"তিবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানে সবার জন্য সমতাভিত্তিক, মানসম্মত শিক্ষালাভের অধিকার ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ১৯৯০সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (বাধ্যতামূলক) জারি হওয়ার পর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নয়ণ পরিকল্পনা ২০০৫ সালের সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০,৪০১টি।[১] এর মধ্যে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১,৭৩,১৫,২৯৬ জন, অর্থাৎ স্কুলে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা ১০,৮৯,৬৩৮ জন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করার আগেই ৪৬% শিক্ষার্থী বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ছে।[২] দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশুই মৌসুমভিত্তিক শিশুশ্রমে নিয়োজিত। এরা রোজগারের মাধ্যমে পিতা-মাতার সংসার চালাতে সহায়তা করে। শিশুদের এসব কর্ম পরর্বতী সময়ে তাদের পেশায় পরিণত হয়। এইসব শিশুদের স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও দারিদ্র্যের কারণে তাদের কাজ করতে হয়। তা না হলে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে হয়।

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** পিএইচ.ডি গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

*** পিএইচ.ডি গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ফিডিং কর্মসূচীর তত্ত্ব ও বাস্ড়বদিক

প্রত্যেক মা-বাবার কাছে সন্ড়ান সবচেয়ে প্রিয়। আর তাই ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই তার প্রিয় সন্ড়ানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায়। সুযোগ পেলেই সন্ড়ানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে বিশেষ করে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিশু আসে দরিদ্র পরিবার অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। এ সব পরিবারের বড় সমস্যা হলো শিশুকে সময়মতো প্রয়োজনীয় খাবার দিতে না পারা। শিশুরা কখনও তিন বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। এটি গ্রামের প্রায় সব দরিদ্র পরিবারের সাধারণ দৃশ্য। কমবেশি গ্রামের প্রায় সকল শিশুর ভিটামিন-এ, লৌহ এবং আয়োডিনের যথেষ্ট অভাব থাকে। পরিবারের আয়স্বল্পতা ও অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে খাবারে প্রয়োজনীয় পুষ্টি থাকে না। ফলে শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। বিশ্বব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ শিশু মাঝারি থেকে গুর"তর অপুষ্টির শিকার, প্রায় ৫৬ শতাংশ শিশু বয়সের তুলনায় কম ওজনের।[৩] একজন শিশুর জন্য নিয়মিত প্রোটিনসহ সুষম খাবারের গুর"ত্ব অপরিসীম। ৫ থেকে ১২ বছর বয়সের বাড়ন্ড় শিশুদের গঠন ও মেধা বিকাশের জন্য দৈনিক ১৮২০-২১৯০ কিলো ক্যালরী প্রয়োজন।[৪] তা না হলে মেধা মননের পরিপূর্ণ বিকাশ, কর্মপ্রেরণা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন পরিস্ফুটিত হয় না। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তারা থাকে অভুক্ত অথবা অর্ধভুক্ত। ক্ষুধার কারণে শিশুরা শেখার ও মনে রাখার ক্ষমতা দুইই হারিয়ে ফেলে। অপুষ্টির কারণে শিশুরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যা শেখান তা ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না। এ কারণে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনও সম্ভব হয় না। এক পর্যায়ে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না, যারা আসে তারা শিখতে পারে না। আমরা জানি, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম বড় সমস্যা হলো শিক্ষাপ্রক্রিয়া থেকে শিশুদের ঝরে পড়া। ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক-এর তথ্য অনুযায়ী, উত্তরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ঝরে পড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ভর্তি হয়েও প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিশু স্কুলে যায় না। দেড় লাখ শিশু অপুষ্টির শিকার। রাতকানাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হয়ে ২ লাখেরও বেশি শিশু বেড়ে উঠছে।[৫] দৃষ্টিহীনতায় ভুগছে আরো প্রায় ৫০ হাজার শিশু।[৬]

স্কুলে গমন ও ভর্তি উপযোগী দেড় লাখ শিশু শহর বন্দর গ্রামে শ্রম বিক্রি করে।[৭] এই শিশুরা স্কুলে যাওয়ার সময় পায় না। উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করেও শিশুদের স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। জাতীয় চক্ষু পরিচর্যা পরিকল্পনা তথ্য অনুযায়ী, উত্তরাঞ্চলে ৫ লাখ শিশু দৃষ্টি স্বল্পতায় ভুগছে। রাজশাহী বিভাগীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের জরিপ রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, পঞ্চগড় জেলায় ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ৬৫ ভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৩২ ভাগ, নীলফামারী জেলায় ৩০ ভাগ। ঝরে পড়া শিশুদের মধ্যে নদীভাঙন ও নদীর দুর্গম চরাঞ্চলের পরিবারের সন্তান বেশি। সমাজে যারা সবচেয়ে প্রান্তিক তাদের শিশুরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অভাবে এইভাবে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুরা এভাবে ঝরে পড়তে থাকে তবে কিভাবে আমরা ২০১০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানো এবং ২০১৪ সালের মধ্যে সবার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারব- সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার একটা কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থা হল প্রাথমিক শিক্ষায় আরও বিনিয়োগ। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বহুগুণে প্রতিদান আসবে। দেশের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে এনে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এর ফলে পুষ্টিহীনতা দূর হয়ে শিশুর শারীরিক বিকাশ, মেধা ও যোগ্যতা বাড়বে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হারও কমবে। প্রাথমিকভাবে আর্থিক খরচ বেশি হলে তা দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ হবে।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর যৌক্তিকতা

আমাদের দেশের বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কুলে টিফিন নিয়ে আসতে পারে না। ক্ষুধার কারণে ক্লাশে লেখা-পড়ায় মনোযোগী হতে পারে না। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে মনোযোগ সহকারে স্কুলে দীর্ঘসময় পড়াশুনা করা সম্ভব হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা সকালের ক্লাশের ন্যায় বিকালের ক্লাশগুলোতেও সমান মনোযোগ দিতে পারবে, শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে, আনন্দ ও আগ্রহের সাথে শিশুরা পাঠগ্রহণে অধিক মনোযোগী হবে, স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে, সাময়িক স্কুল ত্যাগের প্রবণতা দূর হবে, ঝরে পড়া শিশুরা উৎসাহ পেয়ে আবার নিয়মিত স্কুলে আসবে, শিশুদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে দেশের পুষ্টি সমস্যার সমাধান হবে, স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং যে সকল দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদের

স্কুলে না পাঠিয়ে শিশুশ্রমে নিয়োজিত করেন, তারা শিশুদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবে। উলেণ্ঢখিত বিষয় ছাড়াও আরো কিছু আছে তা নিম্নরূপ:

ফিডিং কর্মসূচী যৌক্তিকতা

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ক্লাস চলে। শিশুরা ক্লাস শুরুর পূর্বেই বিদ্যালয়ে আসে। যাদের বাড়ি দূরে বা যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ তাদের অনেককে পূর্বেই বাড়ি থেকে বের হতে হয়। তাছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই শিশুদের বসার ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে শিশুরা সামনে বা ভাল অবস্থানে বসার প্রতিযোগিতায় নামে, আগে আসার চেষ্টা করে। এইভাবে দেখা যায় যে, শিশুরা বিদ্যালয় শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা/এক ঘন্টা আগে বিদ্যালয়ে থাকতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ে ক্লাসে থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে তাদের জন্য খাবার দরকার।

২. আজকাল প্রায় বিদ্যালয়ের ধারেই ছোট ছোট বাজার বা দোকান দেখা যায়। তাছাড়া বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় অনেকে বুট, বাদাম বা বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাবার ফেরি করে বিক্রি করে। এ সব দোকান থেকে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের শিশুরা টিফিনের সময় কিছু কিনে খেয়ে থাকে; কিন্তু গরিব পরিবারের শিশুরা তা পারে না। যদিও তারা একসাথে লেখাপড়া করছে। এক্ষেত্রে বন্ধুর খাওয়া দেখে বাড়ি থেকে না খেয়ে বা কম খেয়ে আসা শিশুটির ক্ষুধার জ্বালা বাড়া ছাড়া কমে না। অনেক শিশু এ সময় মনোকষ্ট ও হতাশায় ভোগে।

৩. বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় কিছু কিনে খাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে আসার সময় অভিভাবকদের নিকট টাকার বায়না ধরে যখন তারা তা পায় না তখন আর বিদ্যালয়ে আসে না। এভাবে তারা আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে।

৪. ছোট ছোট দোকান বা ফেরি করা দোকান থেকে শিশুরা যে ধরনের খাবার কিনে থাকে তা একদিকে যেমন শিশুদের স্বাস্থ্য উপযোগী নয় অন্য দিকে এসকল দোকানে বিচরণ শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি করে।

৫. টিফিন মানে শিশুরা এই সময় একটু ভারমুক্ত থাকবে, খেলাধুলা করবে এবং পুনরায় ক্লাস শুরু হলে পূর্ণভাবে পাঠে মনোযোগ দেবে। কিন্তু পেটে ক্ষুধা নিয়ে তারা খেলাধুলা করতে পারে না বা টিফিনের যে আনন্দ তা ভোগ করতে পারে না।

৬. পরিবারের আয়স্বল্পতা এবং অসচেতনতার কারণে বাড়িতে বিশেষ করে দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে খাবারের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান বজায় থাকে না। ফলে শিশুরা প্রতিনিয়ত পুষ্টিহীনতার স্বীকার হয়। প্রতিটি শিশুর জন্য নিয়মিত

প্রোটিনসহ সুষম খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিমিত খাদ্যের অভাবে শিশুর মেধা ও মননের পূর্ণ বিকাশ হয় না। তারা কর্মপ্রেরণা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনে অমনোযোগী হয়। বিদ্যালয়ে খাবার ব্যবস্থা থাকলে দিনে একবেলা হলেও শিশুদের পুষ্টিচাহিদা অনেকাংশে মিটে যাবে।

৭. বাড়ির দূরত্ব বা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় টিফিনের সময় অনেক শিশু খাওয়ার জন্য বাড়িতে যেতে পারে না বা গেলেও তাড়াতাড়ি করে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে ফিরতে পারে না। এতে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। বিদ্যালয়ে খাবার ব্যবস্থা থাকলে কোন শিশুকে বাড়ি যেতে হবে না।

৮. আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের একবেলা খাবারের ব্যবস্থা চালু আছে।[৮] ভারতসহ বিশ্বের বেশকিছু দেশে বিদ্যালয়ে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে শিশুদের একবেলা খাবারের প্রকল্প চলছে।[৯] অনেক দেশে দরিদ্র পরিবারের জন্য স্কুল টিফিন বাবদ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। তার মধ্যে মালয়েশিয়া অন্যতম। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

৯. দরিদ্র পরিবারের ওপর থেকে আর্থিক চাপ কমানোর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য মধ্যাহ্ন খাবার প্রয়োজন।

১০. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যাহ্ন খাবারের বিষয়টি সকল শিশুর প্রাথমিক অধিকার।

আমরা জানি যে, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দেশের দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন কর্মসূচী চালু হয়েছে যা ৯টি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলায় প্রায় ৪ হাজার বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ৭৫ গ্রাম ওজনের প্রোটিনযুক্ত বিস্কুট প্রদান করছে।[১০] এর ফলে বিদ্যালয়ের ঝরে পড়ার হার কমে গেছে। ভর্তির হার বেড়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় আনুমানিক ১ মিলিয়ন শিশু উপকৃত হচ্ছে মাত্র। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ করে হাওরাঞ্চল, চরাঞ্চল, সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলসহ দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা এ ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) স্কুল টিফিন কার্যক্রমের একটি সম্ভাব্য হিসাব দিয়ে বলা হয়েছে, যদি প্রাথমিক শিক্ষায় খাদ্য কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে চালানো যায়, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষায় মানোন্নায়ন তো বটেই একই সঙ্গে তা পুষ্টি সমস্যার সমাধানেও ভূমিকা রাখতে পারে।

পিআরএসপির আলোকে প্রস্তাবিত স্কুল ফিডিং[১১]

সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) স্কুলে ফিডিং কর্মসূচীর একটি সম্ভাব্য বাজেট দিয়েছে।

খাত	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৮	মোট
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি মিলিয়ন	১৬.৯	১৭.৫	১৮.৩	১৯.১	১৯.৮	৯১.৫
নির্দেশিত শ্রেণীকক্ষ মিলিয়ন টাকা	১৩.৫	১৪.০	১৪.৬	১৫.৩	১৫.৮	৭৩.২

প্রস্তাব-১

খাত	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৮	মোট
বিদ্যালয়ের কর্মদিবস	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০
প্রতি শিক্ষার্থীর দিনপ্রতি খাবার (টাকা)	১০	১০	১০	১০	১০	১০
মোট খাবার খরচ (বিলিয়ন টাকা)	২৭.০	২৮.০	২৯.২	৩০.৫	৩১.৬	১৪৬.৩
মোট ব্যবস্থাপনা খরচ (বিলিয়ন টাকা)	২.৭	২.৮	২.৯	৩.১	৩.২	১৪.৬
প্রকল্প খরচ (বিলিয়ন টাকা)	২৯.৭	৩০.৮	৩২.১	৩৩.৬	৩৪.৮	১৬১.০

প্রস্তাব-২

খাত	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৮	মোট
বিদ্যালয়ের কর্মদিবস	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০
প্রতি শিক্ষার্থীর দিনপ্রতি খাবার (টাকা)	৫	৫	৫	৫	৫	৫
মোট খাবার খরচ (বিলিয়ন টাকা)	১৩.৫	১৪.০	১৪.৬	১৫.৩	১৫.৮	৭৩.২
মোট ব্যবস্থাপনা খরচ (বিলিয়ন টাকা)	১.৩	১.৪	১.৫	১.৫	১.৬	৭.৩
প্রকল্প খরচ (বিলিয়ন টাকা)	১৪.৮	১৫.৪	১৬.১	১৬.৮	১৭.৪	৮০.৫

স্কুল ফিডিং প্রকল্পের জন্য পিআরএসপিতে প্রস্ড়াবিত বাজেট

স্কুল ফিডিং প্রদান সম্পর্কে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, এই প্রকল্প ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ড় ৫ বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হবে, প্রকল্পের সময়সীমায় প্রতি বছর ৮০% শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিং এর সুবিধাভোগী হবে। বছরে বিদ্যালয়ের মোট কর্মদিবস ২০০ ধরা হয়েছে। স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় দু'ধরনের বাজেট প্রস্ড়াব উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। প্রথম বাজেট প্রস্ড়াবে শিক্ষার্থী প্রতি ১০ টাকা এবং দ্বিতীয় প্রস্ড়াবে ৫ টাকা ধরা হয়েছে।[১২]

বর্তমান সময়ের বাস্ড়ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য মধ্যাহ্ন খাবারের ব্যবস্থা চালু করা খুবই জর"রি। এ জন্য এমন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে প্রাথমিক বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ে শিশুরা স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেয়ে পুষ্টি চাহিদা মেটাতে পারে, শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হয়, অভিভাবক বা সংশিণ্ঢষ্ট কমিউনিটির দরিদ্র নারী-পুর"ষের আয় উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, বিদ্যালয়ের প্রতি কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং একই সাথে বিদ্যালয় আয় বৃদ্ধি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য রান্না করা টাটকা 'মধ্যাহ্নকালীণ খাবার' এর ব্যবস্থা করলে এটা সম্ভব হতে পারে।

রান্না খাবার ও প্যাকেটজাত খাবারের বিভিন্ন দিক

১. শিশুরা স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব খাবার খাবে;

২. প্রাথমিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশু ঝরে পড়া আরও হ্রাস পাবে;

৩. শিশু ভর্তির হার আরও বৃদ্ধি পাবে;

৪. দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

৫. শিশুদের পুষ্টি যোগান নিয়মিত হবে;

৬. বিদ্যালয়ে শিশু পুনরাবৃত্তি হ্রাস হবে;

৭. শিশুদের ওপর আয়োডিনজনিত রোগের প্রভাব কমবে;

৮. শিশুদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে;

৯. সাময়িক স্কুল ত্যাগের প্রবণতা হ্রাস পাবে;

১০. দরিদ্র অভিভাবকদের ওপর থেকে আর্থিক চাপ কমবে;

১১. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে;

১২. মেধার সুষম বিকাশ ঘটবে;

১৩. বিদ্যালয় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে;

১৪. এলাকার প্রান্ড়িক ও ক্ষুদ্র কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজেই বিক্রি করতে পারবে;

১৫. সংশিণ্ঢষ্ট কমিউনিটির দরিদ্র নারী পুর"ষের আয় উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;

১৬. দরিদ্র নারী পুর"ষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

১৭. বিদ্যালয়ে শিশুদের হাতে কলমে শেখার পরিবেশ বৃদ্ধি পাবে;

১৮. বিদ্যালয়ের প্রতি কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে;

১৯. বিদ্যালয়ে অব্যবহৃত ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে;

২০. স্থানীয় প্রশাসনের সকল সেক্টরের সাথে বিদ্যালয়ের যোগসূত্র স্থাপিতহবে এবং বিদ্যালয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। আন্ড়মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যালয় হয়ে উঠবে সামাজিক বাড়ি;

২১. শিশুশ্রম হ্রাস পাবে;

২২. বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে;

২৩. নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। ফলে এইচআইভির ঝুঁকি কমে যাবে। উলেণ্ঢখ্য, আফ্রিকার এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, নারীদের শিক্ষিত করাই হলো এর সবচেয়ে ভালো প্রতিষেধক;

২৪. শিশুরা তাদের বাড়ির খাবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গরম খাবার খেতে পারবে;

২৫. জেন্ডার সমতা সৃষ্টির পথ প্রশস্ড় হবে। বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন খাবারের মাধ্যমে শিশুর (মেয়ে-ছেলে) একসাথে চলা, একসাথে খাওয়া, মিলে মিশে থাকা ইত্যাদির চর্চা গড়ে উঠবে। শিশুরা বিদ্যালয়ের এই চর্চা পরিবারের সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। পরিবারে নারী পরে খাবে আর পুর"ষ আগে খাবে এই অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। যার মাধ্যমে সমাজে জেন্ডার সমতা সৃষ্টির পথ প্রশস্ড় হবে;

প্যাকেটজাত খাবার উৎপাদন হয় বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। তাদের লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন। এ ধরনের খাবার যেমন- বিস্কুট কিনে বিদ্যালয়ের শিশুদের দিলে

শিশুদের পুষ্টি চাহিদা হয়ত মিটে যায়; কিন্তু একই খাবার শিশু প্রতিদিন খেতে চায় না। স্থানীয়ভাবে তৈরি না হওয়ায় পরিবারের নিত্যদিনের খাবারের মত মনে হয় না। তাছাড়া কমিউনিটির অংশগ্রহণ বা কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ থাকে না।

আমাদের দেশের জন্য এ সকল বিষয়ে এমন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন, যার মধ্য দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তি খাতের উৎপাদনের সুযোগ বাড়ানো যায়, দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং মেয়াদান্তে কার্যক্রমটি চলমান রাখা যায়। একটা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে কীভাবে সমাজের সবচেয়ে গরীব মানুষটির অবস্থা ভালো হতে পারে তা ভাবা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয় প্রাধান্য দেয়া উচিত।

১. পাইলটিং ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য রান্না করা গরম খাবার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

২. এলাকায় উৎপাদিত, সহজলভ্য এবং মওসুমভিত্তিক পণ্যসামগ্রীর ভিত্তিতে একটি খাদ্য তালিকা থাকবে। এই তালিকা অনুযায়ী প্রতিদিন বিদ্যালয়ে সংশিণ্টষ্ট এলাকায় খাবার রান্না হবে এবং শিশুরা টিফিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গরম খাবার খাবে। ক্লাস খোলা থাকা ৫ দিনের (বৃহস্পতিবার ব্যতীত) মধ্যে ২ দিন ডাল ও সবজি খিচুড়ি, ২দিন ডাল এবং মাংস (খাসি/দেশি মুরগি) খিচুড়ি ও ১ দিন ডাল এবং ডিম ভাত) দেয়া যেতে পারে। প্রতিদিন একই খাবার না দিয়ে যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাবার দেয়া হয় তাহলে খরচে সাশ্রয় হবে এবং স্বাদে ভিন্নতা আসবে। স্থানীয় পর্যায়ে যদি দায়িত্ব দেয়া যায় তবে এগুলো দূষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সংশিণ্টষ্ট গ্রামের দরিদ্রদের ভেতর থেকে নারী বাবুর্চি নেয়া যেতে পারে। এতে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। অভিভাবকদের বিশেষ করে মা'দের মধ্যে থেকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ভলান্টিয়ার নির্বাচন করে তার একটা তালিকা করা যায় যারা খাদ্য বিতরণে সহযোগিতা করবে। প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪/৫ জন ব্যক্তি ঠিক করে নিতে হবে।

৩. কর্মসূচীর বিষয় ও বাজেট জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করে তাতে লিখে রাখলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে।

৪. বিদ্যালয়গুলো যাতে ভবিষ্যতে এসএমসি'র ব্যবস্থাপনায় শাকসবজি উৎপাদন করতে পারে সে পদক্ষেপ নেয়া যায়।

৫. দেশের প্রায় সব প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশিণ্টষ্ট এলাকার এক বা একাধিক উদ্যোগী ব্যক্তির দানকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জমির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। কোন কোন এলাকায় ভূমির পরিমাণ প্রায় ১ একরের বেশি। বিদ্যালয় ভবন, বাগান, খেলার মাঠ ও প্রয়োজনীয় রাস্ড়া ছাড়া বেশকিছু অব্যবহৃত ভূমি প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ড় স্থানে আধুনিক পদ্ধতিতে

বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করা যায়, বিদ্যালয়ের বড় বড় গাছগুলোর সাথে পান গাছের চাষ করা যায়, নিচু জায়গায় মাছ চাষ করা যায়, খাসজমি বা রাস্ড়ার ধারে কিছু শিম, লাউ ইত্যাদি চাষ করা যায় যা বিদ্যালয়ে শিশুদের দুপুরের খাবার যোগাতে অবদান রাখবে। তবে বিদ্যালয় থেকে তা কিনে নিতে হবে। বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট তহবিলে এ সমস্ড় পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করা টাকা জমা থাকবে যা দিয়ে পাইলটিং শেষে এ কার্যক্রম চলতে পারবে।

৬. স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, পশু চিকিৎসক এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। তবে এ জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বাড়বে তেমনি বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৭. বিদ্যালয়গুলোর একমাত্র উপজেলা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, পশুপালন বিভাগ, সমাজসেবাসহ অনেক বিভাগ আছে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে যারা বিদ্যালয়ের কাজের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। এই আন্ড়বিভাগীয় সম্পর্ক বিদ্যালয়ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষা খাত বিছিন্ন কোন খাত হতে পারে না।

৮. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ইউপি সদস্য, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় বিভিন্ন সমিতির সদস্য, সাংবাদিক, স্বাস্থ্যকর্মী, কৃষি কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, এনজিও কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা ও কর্মীদের নিয়ে একটি 'মধ্যহ্নকালীন গরম খাবার' ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা এই কার্যক্রম মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। তবে বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক রান্না, ক্রয় বা খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি কোন কাজে জড়িত থাকবেন না। উপজেলাভিত্তিক কমিটি থাকতে হবে।

৯. রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় সবজি, ডিম, মাংস, চাল, ডাল ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে এলাকভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র কৃষক চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে যারা সঠিক দামে বিদ্যালয়ে পণ্য পৌছে দিতে পারে। এর ফলে তারা উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম পাবে এবং উৎপাদনে উৎসাহিত হবে।

১০. বিদ্যালয়ের নামে স্থানীয় হাটবাজার, খেয়াঘাট ইজারা, পুকুর বা জলাশয় ইজারা নিয়ে মাছের পোনা ছাড়া ইত্যাদি বিদ্যালয়ের একটি আয়ের উৎস হতে পারে , যা এ কার্যক্রমকে সহযোগিতা করবে।

সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের দুপুরের খাবার সরবরাহের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এই কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন না হলে শিশুর অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহানি ও শিক্ষার মানের যে অবনতি ঘটবে তাতে জাতির সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ হবে আরো অনেক বেশি যা অর্থের মাপকাঠিতে মাপা সম্ভব নয়। দেশে এখনও ৯০ লাখ স্কুল গমনোপযোগী বয়সের শিশু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে। যাদের বয়স ৬-১৮।[13] যারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৪৮% শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করার পূর্বেই ঝরে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি উদ্যোগে এ ধরনের অনেক কর্মসূচি চলছে যেখান থেকে ভালো, সাশ্রয়ী উদ্যোগুলোকে মূলধারায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

প্যাকেট খাবার ও রান্না করা খাবারের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা

স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় রান্না করা খাবারের চেয়ে প্যাকেট খাবার সরবরাহ করা সুবিধাজনক। এতে স্কুলের পরিবেশ নোংরা হবে না, বিতরণের ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না। রান্না করা স্কুল ফিডিং সরবরাহ করা হলে অনেক জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন, স্কুলের নিকট রান্নাঘর তৈরি, অতিরিক্ত লোক নিয়োগ, থালা, গণ্ঢাস, জগ, চাল, ডাউলসহ অন্যান্য উপকরণ রাখার জন্য আলাদা কক্ষের প্রয়োজন হবে।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান

স্কুল ফিডিং কর্মসূচীকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে একদিকে বিদ্যমান পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় এবং অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। যদি কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে প্যাকেট খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং পাশাপাশি অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লোকদের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে এই সব জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান সুবিধা পাবে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় (২ থেকে ২.৫ কিলোমিটার) ২৫ জন দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্কুল ফিডিং বিতরণ দল গঠন করা যেতে পারে। এই দলের সদস্যদের এক মাসব্যাপী পুষ্টি ও আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া (মুরগী/হাঁস, গাভী/মহিষ) পালন, কলা চাষ, সম্পূরক খাদ্যের পিঠা তৈরি করা) যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে স্কুল ফিডিং বিতরণকারী দল গঠন করা হলে (৮০৪০১দ্ধ২৫ জন) ২০,১০.০২৫ জন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

স্কুল ফিডিং বিতরণকারী দল শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সার্ভিস চার্জসহ **১১** টাকার মধ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে স্কুল ফিডিং সরবরাহ করতে পারবে। স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় প্রতি দিন চাউলের পিঠা ও চিনি/গুড় থাকবে এবং সাপ্তাহিক র্ র্টিন

অনুসারে একেক দিন ডিম, কলা ও দুধ বিতরণ করা হলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর মাধ্যমে ৫৮৩ কিলোক্যালোরি পাবে।[14] এর ফলে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন অপুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে তেমনি স্কুল চলাকালীন সময়ে পাঠগ্রহণে মনোযোগী হবে। একটি ডিমে **১৭৩** কিলোক্যালোরি পাওয়া যায়। একটি কলায় পাওয়া যায় **১০৯** কিলোক্যালোরি, দুধ **২০০** মিলিলিটার দুধে **১৩৪** কিলোক্যালোরি পাওয়া যায়, **১০০** গ্রাম চাউলের পিঠায় পাওয়া যায় ৩৪৬ কিলো ক্যালোরি, ২০ গ্রাম চিনি/গুড় এ পাওয়া যায় ৯৯ কিলোক্যালোরি।[15] স্কুল ফিডিং কার্যক্রম মূল খাদ্য হিসেবে নয়,সম্পূরক খাবার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।[16] পিআরএসপিতে স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় **১ম** প্রস্ড়াবে **১০** টাকা এবং দ্বিতীয় প্রস্ড়াবে ৫ টাকায় কী ধরনের খাদ্য দেওয়া হবে, তার উলেণ্ঢখ নেই। কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর প্রস্ড়াবিত **১১** টাকার মধ্যে উলিণ্ঢখিত খাবার বিতরণ করলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা ৫৮৩ কিলোক্যালোরি পাবে এবং কমিউনিটি উদ্দ্যোক্তারা শিক্ষার্থীপিছু **২** টাকা করে সার্ভিস চার্জ পাবে।[17]

কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচী ব্যবস্থায় সুবিধা

কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচী ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় থাকবে, কোন সংস্থা বা কোম্পানী একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবে না, স্কুল ফিডিং কর্মসূচী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকবে, ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে, বিতরণ ব্যবস্থা স্বচ্ছ থাকবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

স্কুল ফিডিং বিতরণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা

স্কুল ফিডিং বিতরণ ও মনিটরিং ব্যবস্থায় এসএমসি, শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা যদি জড়িত থাকে, তাহলে স্কুল ফিডিং খাদ্যের মান নিশ্চিত হবে, বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় থাকবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সকল শিশু খাবার পাবে, বিতরণ ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব হবে না।

সুপারিশসমূহ

ক. স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা;
খ. কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন;
গ. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সরকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিটি স্কুলে ক্যাচমেন্ট এলাকায় গবাদি পশুর ও হাঁস ও মুরগীর খামার গড়ে তোলা;
ঘ. স্থানীয় উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে তৈরি স্কুল ফিডিং বিতরণ করা;

উপসংহার

আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে স্কুল ফিডিং কর্মসূচী রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের জন্য সরকারসহ সমাজের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। মূলতঃ রাষ্ট্রের উদ্যোগেই কার্যক্রম চলবে। এতে স্কুল শিক্ষার সার্বিক ফলাফল ভাল আসবে। বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি। সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশুকে উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় ফিরিয়ে আনা এবং জ্ঞানভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন অত্যাবশ্যক। যদি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিডিং সিস্টেম বিষয়টি গুর“ত্ব না দেয়া হয় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. A.K.M Mofijul Islam, Primary Education in Bangladesh (Dhaka: Prime Publication House, 2005), p. 36.

২. Education Watch, 2006 (Dhaka: CAME, 2006), p. 82.

UNICEF, The State of the World's Children, 2007 (New York: United Nations Childrens Fund, 2007), p. 19.

৩. Ibid., p. 20.

৪. Abdul Jabbar, Child Labour: A Serious Concern in Today's World, The Journal of Social Development, Vol. 14, No-1, p. 33.

৫. Md. Abu Taher, Child Labour in Dhaka City Dimentions and Implications (Dhaka: Sangati Printers, 2006), p. 54.

৬. Ibid., p. 34

৭. Rashed Al Mahmud Titumir Jakir Hossain, Encountering Exclusion Primary Education Policy watch, Dhaka, The Innovators, 2004, p. 25.

৮. Dr. Zotchy Roy, stritty and working children in India (New Delhi, UNESCO, 2004), p. 64.

৯. গণসাক্ষরতা অভিযানঃ সাক্ষরতা বুলেটিন, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০৭, সংখ্যা-১৬৫, পৃ. ১৯।

১০. প্রাগুক্ত., পৃ. ২০।

১১. প্রাগুক্ত., পৃ. ২২।

১২. গণসাক্ষরতা অভিযানঃ সাক্ষরতা বুলেটিন, ঢাকা, জুলাই, ২০০৯, সংখ্যা-১৮৫, পৃ. ১৬।

১৩. Md. Humayun Kabir, Effect of Food and Nutrition on Academic Achivement Performance of selcected Group of Primary School Students: A Critical Understanding, The Official Journal of Centre of Human, Resources Information and Development, Dhaka, Vol. 01, No. 2, March, 2009. p. 1.

১৪. Ibid., p. 2.

১৫. Md. Azhar Ali, Education System in Bangladesh (Dhaka: CAMPE, 2003), p. 13.

১৬. Md. Humayun Kabir, Educational Oppourtunities of the Urban poor children's in Bangaldesh: A Study on Rajshi City, Ajournal of CHRID Bangladesh, Dhaka, Vol. 2. Sl. 3, p. 27.

১৭. Ibid., p. 28.